চন্ডাল একটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ যে বা যে সম্প্রদায় মৃতদেহ সৎকারের কাজে নিয়োজিত। একটি নিম্নবর্ণের হিন্দু। প্রথাগতভাবে চন্ডালদের অস্পৃশ্য হিসেবে ধরা হয়।

শ্রেনীকরণ

বর্ণ হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি সামাজিক বিভাজন ব্যবস্থা, যার উৎপত্তি বেদ। সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যসূত্র হিসাবে বেদই হচ্ছে সমাজের বর্ণ ব্যবস্থার উৎস। মূলত ব্রাহ্মণীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণ মতবাদ কোন একটি বিশেষ উপলক্ষে সৃষ্টি করা হয়েছিল যা কার্যত অপরিবর্তিত রয়ে যায়। জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখাই হল বর্ণভেদ ধারণার মূল বিষয়। জাতিগত ক্রোমউচ্চতা অনুযায়ী সমাজের সকল জাতিকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে যথা- ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। ঋকবেদের সূক্তের ভাষ্য অনুযায়ী স্বয়ং ব্রহ্মাই চারটি বর্ণের সৃষ্টিকারী। ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মনগণ সৃষ্ট হয়েছেন যাদের কাজ পূজা অর্চনা ও শিক্ষাদান। বাহু থেকে সৃষ্ট হয়েছেন ক্ষত্রিয়গণ যাদের কাজ দেশরক্ষা ও রাজ্য পরিচালনা করা। ব্রহ্মার উরু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বৈশ্যদের, যাদের কাজ ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষিকাজ। ব্রহ্মার পা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুদ্রদের যাদের কাজ বাকি তিন উচ্চ বংশীয়দের সেবা করা। [৩] এই চার বর্ণের বাইরে আরো একটি বর্ণ আছে। এই পঞ্চম ভাগটি হল চন্ডাল বা অস্পৃশ্য।

চন্ডালদের সম্পর্কে দুইটি ধারণা প্রচলিত। একটি ধারণায় বলা হয় যে তারা মূল বসতির বাইরে অবস্থান করত। হয়ত তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না অথবা তারা খাদ্য সংগ্রহ বা অন্যান্য কারণে পৃথক স্থানে তাদের আবাস গড়ে তুলেছিল। তাদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের নিকট বোধগম্য ছিল না। তাদের পেশাকে অত্যন্ত নিচু কাজ হিসাবে গন্য করা হত যেমন, শিকার বা নলখাগড়ার মাদুর প্রস্তুত করা প্রভৃতি। অন্য ধারনায় বলা হয় যে, ইন্দো-গঙ্গা সমতলভূমির নগরীগুলো আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তৈরী হয় যাদেরকে পরবর্তীতে ভৃত্যশ্রেনীর কাজে নিয়োগ করা হয়। আজকাল চন্ডালদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োগে কোন সামাজিক বাধা নেই।

আধুনিক ভারতে চন্ডাল শব্দটি কোন কিছু নিন্দনীয়, নোংরা বা নীচ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ধর্মাচার

চন্ডালরা মূলত বৈঞ্চব মতালম্বী হিন্দু। তারা বানসুরা পূজা বা নদীর দেবতার পূজা, মনসা পূজা, মাটির দেবতার পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার পালন করে থাকে। চন্ডালদের মধ্যে ব্রাহ্মন আছে। তারা বর্ণ ব্রাহ্মন বা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মন নামে পরিচিত। তারা চন্ডাল সমাজে পূজা পার্বন পরিচালনা করেন।

উনিশ শতকের হিন্দু সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ চন্ডালদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি চাইতেন চন্ডালরা ব্রাহ্মণদের মর্যাদায় উন্নীত হোক

।সাপুড়ে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায়, যারা বাঁশিসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এবং নানা উপায়ে সাপের খেলা দেখায়। সাপ অবশ্য বায়ুবাহিত শব্দ-তরঙ্গ অনুভব করে না, ফলে এতে সাপের সাড়ার প্রশ্ন আসে না। সাপেরসাপুড়ে খেলা দেখানো কারও সার্বক্ষণিক এবং কারও খন্ডকালীন পেশা। এটি ঐতিহ্যগতভাবে পারিবারিক পেশা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়। এতে আছে কঠোর গোপনীয়তা। বেদে বা বাংলাদেশী যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্তরা সাপুড়ে নামে পরিচিত। পানিতে ভাসমান নৌকাতেই এদের জীবন কাটে। কোন কোন পরিবারে কেবল বেদেনীরাই সাপের খেলা দেখায়। বেদে-বেদেনীরা কাঠের বাক্সে, চটের ব্যাগে, বাঁশের ঝুড়িতে ও মাটির পাত্রে নানা ধরনের সাপ রাখে এবং সাপ্তাহিক হাট-বাজারে খেলা দেখানোর জন্য সেগুলি নিয়ে যায় অথবা কোন শহরের বাজারে মাসের পর মাস অবস্থান করে খেলা দেখায়, তারপর হয়তো অন্য স্থানের দিকে রওনা দেয় যেখানে সবসময় প্রচুর লোকসমাগম থাকে।

বেশির ভাগ সাপুড়েই সাপ ধরে না, পেশাদার সাপ সংগ্রাহকদের কাছ থেকে সাপ কিনে নেয়। তবে সাধারণভাবে প্রায় সব সাপুড়েই নিজেদের সংগ্রহে বেশ কিছু সাপ জমা রাখে। সাধারণত গোখরা ও অজগরই এদের বেশি পছন্দ, তবে নির্বিষ সাপও তারা রাখে। সাপুড়েদের গোখরা পছন্দের কারণ গোখরা মাথার ফণা খানিকটা মাটির উপরে শূন্যে তুলে স্থির রাখতে বা দোলাতে এবং মেলে ধরতে পারে, যাতে থাকে দৃষ্টিনন্দন নকশা। সাপুড়ে বাঁশি বাজানো ও ‘মন্ত্র’ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা, কনুই ও হাঁটু দোলায় এবং গোখরাও সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে ফণা দোলাতে থাকে। তবে গোখরা বাঁশির সুরে নয়, সাপুড়ের দোলায়মান মাথা, হাঁটু ও কনুইয়ের দিকে দৃষ্টি স্থির করার লক্ষ্যেই দুলতে থাকে। সাপুড়ে অনেক সময় নিজের অঙ্গ না দুলিয়ে কৌশলে সাপ রাখার বাক্সের ঢাকনা বা পাত্রকে সাপের সামনে দোলায়। সাপুড়ে আসলে সাপকে উত্যক্ত করে, যাতে সাপ ছোবল মারে। সাপ যখন কোন বস্ত্ততে দৃষ্টি স্থির করে তখন সে বস্ত্তটিকে আক্রমণ করতে যায়, নয়তো জোরে হিস হিস শব্দ করে।

অধিকাংশ সাপুড়ে সেসব সাপ নিয়েই খেলা দেখায় যেগুলির বিষদাঁত আগেই উপড়ানো হয়েছে। কাজেই বিষদাঁতহীন সাপের ছোবলে সাপুড়ের দেহে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে না। বিষদাঁতহীন সাপ তার স্বাভাবিক খাদ্য খেতে পারে না। বিষদাঁতের অভাবে সাপ বিষগ্রন্থি নিঃসৃত বিষের সাহায্যে শিকারকে অবশ করতে পারে না, তাতে হজমের গন্ডগোল ঘটে, ফলে সাপগুলি ৬ মাসের মধ্যে মারা যায়। সাপুড়েরা এজন্য কয়েক মাস পর পর সাপ সংগ্রহ করে। উলে­খযোগ্য যে, গোখরার উপড়ানো বিষদাঁতের পরের দাঁতগুলি বিষগ্রন্থির সংস্পর্শে আসে। ফলে এরূপ গোখরার কামড় সাপুড়েদের জন্য মারাত্মক হয়। অধিকাংশ সাপুড়েই শেষ পর্যন্ত এ ধরনের সাপের কামড়েই জীবন হারায়। কিছুসংখ্যক সাহসী ও পেশাদার সাপুড়ে বিষদাঁত না উপড়ানো বিষধর সাপ সংগ্রহে রাখে। এদের কেউ কেউ ‘মন্ত্রপড়া’ তাবিজ অথবা ভেষজ বিক্রি করে। লোকবিশ্বাস, শরীরে তাবিজ ধারণ করলে বা ঘরে সাপের ঔষধ রাখলে সাপে কাটে না।